Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 82-90
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.051

মনসামঙ্গল কাব্যে ক্ষমতা, জ্ঞান এবং প্রতিরোধ: ফুকোর আলোকে পাঠ

ড. মো. নাজমুল হাসান, *স্বাধীন গবেষক, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 29.01.2026; Accepted: 31.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article reinterprets the medieval Bengali epic *Manasamangal* through the theoretical framework of Michel Foucault's concept of power, moving beyond its conventional reading as a religious conflict between the goddess Manasa and the merchant Chand Sadagar. Instead, the study argues that the narrative exemplifies Foucault's idea of the micro-physics of power, where power operates as a fluid, relational, and decentralized force rather than a fixed possession. The conflict in *Manasamangal* is analysed as a clash between competing regimes of truth. Chand Sadagar represents the dominant Shaivite discourse sustained by social authority and economic prestige, while Manasa embodies an emergent, subaltern power striving for symbolic and institutional legitimacy. Chand's refusal to worship Manasa is interpreted not as mere obstinacy but as a strategic defense of an established power–knowledge structure. The article further examines the shift from sovereign power to disciplinary power. Manasa initially exercises sovereign authority through overt acts of punishment, including the destruction of Chand's wealth and the death of his sons. However, the narrative later emphasizes subtler mechanisms of control. Chand's construction of the iron chamber (*lauha-basarghar*) is read as an attempt at spatial discipline and security, paralleling the logic of the Panopticon. This effort fails as Manasa's serpents function as agents of omnipresent surveillance, revealing the inescapability of power relations. Finally, the article focuses on Foucault's assertion that power always produces resistance. Chand's final act of worship—offering a flower with his left hand while averting his gaze—is interpreted as a tactical compromise that acknowledges authority without complete ideological submission. The article concludes that *Manasamangal* offers a nuanced literary representation of power, resistance, and negotiation, anticipating key Foucauldian insights.

Keywords: Manasamangal, Michel Foucault; Micro-Politics of Power, Power/Knowledge, Regimes of Truth, Disciplinary Power, Resistance; Panopticon

ক্ষমতা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা রাষ্ট্রের দমনমূলক আইন। কিন্তু মিশেল ফুকো এই প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা কোনো বস্তু নয়, যা কেউ দখল করে রাখতে পারে; বরং ক্ষমতা হলো একটি সামাজিক সম্পর্ক যা সমাজের প্রতিটি স্তরে নেটওয়ার্কের মতো

ছড়িয়ে আছে। ফুকোর এই চিন্তাধারা মূলত 'ক্ষমতার অণু-পদার্থবিদ্যা' (Micro-physics of Power) হিসেবে পরিচিত। ফুকোর আগে ক্ষমতাকে দেখা হতো 'সার্বভৌম ক্ষমতা' (Sovereign Power) হিসেবে। যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র দণ্ড দেওয়ার অধিকার রাখত। ফুকো এই ধারণাকে সরিয়ে ক্ষমতার একটি নতুন রূপ সামনে আনেন। ক্ষমতা কেবল আইন বা অধিকারের বিষয় নয়, এটি একটি কৌশল (Strategy)। ক্ষমতা কেবল 'না' বলে না বা দমন করে না, বরং ক্ষমতা নতুন জ্ঞান, নতুন সত্য এবং নতুন পরিচয় তৈরি করে। অর্থাৎ ক্ষমতা উৎপাদনশীল (Productive)। মিশেল ফুকো আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় ক্ষমতা ধারণাকে আমূলভাবে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গতানুগাতিক রাজনৈতিক দর্শনে যেখানে ক্ষমতা মূলত রাষ্ট্র, আইন, সার্বভৌমত্ব বা কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত, সেখানে ফুকো ক্ষমতাকে দেখেছেন ছড়ানো, সম্পর্কগত এবং দৈনন্দিন জীবনের গভীরে প্রোথিত একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। ক্ষমতা তাঁর কাছে কেবল দমন বা নিষেধের যন্ত্র নয়; বরং এটি উৎপাদনশীল, জ্ঞান সৃষ্টি করে, বিষয় (subject) তৈরি করে এবং সামাজিক বাস্তবতাকে গঠন করে (Basu 40-41)।

ফুকোর ক্ষমতা-ধারণা হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি, বরং এটি পশ্চিমা চিন্তার দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলাপে গড়ে উঠেছে। হোবস, লক, রুশো বা মার্ক্সের মতো চিন্তাবিদদের কাছে ক্ষমতা মূলত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসক শ্রেণির কর্তৃত্ব বা উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণই ছিল ক্ষমতার মূল রূপ। ফুকো এই ধারণাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা কেবল উপরে থেকে নিচে কাজ করে না; বরং এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি সম্পর্কের ভেতরে কাজ করে। ফুকো নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক স্কুলে আবদ্ধ করেননি। তিনি ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে ক্ষমতার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যে আমরা যাকে স্বাভাবিক, সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তার পেছনে কী ধরনের ক্ষমতা-সম্পর্ক কাজ করে। ফুকোর কাছে ক্ষমতা কোনো বস্তু নয়, যা কেউ দখল করে রাখে। এটি একটি সম্পর্ক। যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আচরণ প্রভাবিত করার চেষ্টা থাকে, সেখানেই ক্ষমতা বিদ্যমান। এই কারণে ক্ষমতা সর্বত্র, কারণ সামাজিক সম্পর্ক সর্বত্র। ফুকো বলেন, ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্র, স্কুল, হাসপাতাল, কারাগার, পরিবার, এমনকি ভাষা ব্যবস্থার মধ্যেও ক্ষমতা কাজ করে। ক্ষমতা মানে শুধু নিষেধাজ্ঞা আর দমন নয়; এটি মানুষকে নির্দিষ্টভাবে ভাবতে, বলতে ও আচরণ করতে শেখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষমতাকে নেতিবাচক ধারণা থেকে বের করে এনে একটি উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে তুলে ধরে।

ফুকোর চিন্তায় জ্ঞান ও ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তিনি বলেন, জ্ঞান মানেই ক্ষমতা এবং ক্ষমতা মানেই জ্ঞান। এখানে তিনি বোঝাতে চান না যে জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। বরং যে জ্ঞানকে আমরা বৈধ বা সত্য বলে মেনে নিই, তা নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ফুকোর পাগলামি বিষয়ক গবেষণার কথা বলা যায়। মধ্যযুগে যাকে পাগলামি বলা হতো, আধুনিক যুগে তা মানসিক রোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এই পরিবর্তন নিছক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নয়; বরং এটি চিকিৎসাবিদ্যা, রাষ্ট্র ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন ক্ষমতা কাঠামোর ফল। কোন আচরণ স্বাভাবিক, কোনটি অসুস্থ—এই সিদ্ধান্তগুলো ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হয়। ডিসকোর্স ফুকোর ক্ষমতা বিশ্লেষণের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। ডিসকোর্স বলতে তিনি কেবল ভাষা বা কথাবার্তা বোঝান না। ডিসকোর্স হলো এমন এক জ্ঞান-ব্যবস্থা যা নির্ধারণ করে কী বলা যাবে, কী বলা যাবে না, কোন বিষয় সত্য হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং কে কথা বলার অধিকার পাবে। ডিসকোর্সের মাধ্যমে ক্ষমতা কাজ করে কারণ এটি মানুষের চিন্তা ও উপলব্ধির সীমা নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যৌনতা নিয়ে আধুনিক সমাজে যে আলোচনা হয়, তা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ্যাগত

ও নৈতিক ডিসকোর্সের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে যৌনতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে সামাজিকভাবে নির্মিত হয়ে ওঠে (Basu 42-43)।

ফুকোর ক্ষমতা-ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শাস্তিমূলক ক্ষমতা বা disciplinary power। তাঁর বই *'Discipline and Punish'*-এ তিনি দেখান, আধুনিক সমাজে শাস্তি প্রদানের ধরন কীভাবে বদলে গেছে। আগে শাস্তি ছিল প্রকাশ্য, শারীরিক এবং নাটকীয়। কিন্তু আধুনিক যুগে শাস্তি হয়ে উঠেছে সূক্ষ্ম, নিয়মিত এবং মানসিক। কারাগার, স্কুল, সেনাবাহিনী, হাসপাতাল— এই প্রতিষ্ঠানগুলো শাস্তিমূলক ক্ষমতার উদাহরণ। এখানে ক্ষমতা কাজ করে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা, শ্রেণিবিন্যাস এবং স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে। মানুষকে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং সেই মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি হলে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। আধুনিক চিন্তকদের মধ্যে মিশেল ফুকো অন্যতম একজন প্রধান তাত্ত্বিক। তিনি মূলত ক্ষমতা তত্ত্বের দার্শনিক। বহু বিচিত্র গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্ষমতা তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি মাত্রা আমাদের নজরে আসে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty), অনুশাসন (Discipline) এবং প্রশাসনিকতা (Governmentality)। এই ক্ষমতা তত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখে নেওয়া যাক, ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্ব কীভাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কাজ করেছে।

মিশেল ফুকো ক্ষমতাকে কেবল রাষ্ট্র বা আইনের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে দেখেননি। তাঁর মতে, ক্ষমতা হলো একটি নেটওয়ার্ক যা সমাজের প্রতিটি স্তরে ক্রিয়াশীল। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য হলো দেবী মনসা এবং বণিক চাঁদ সদাগরের সংঘাত। এই সংঘাত কেবল ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই নয়; বরং এটি একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধের গল্প। ফুকোর ভাষায় বলতে গেলে, এটি একটি 'নতুন ডিসকোর্স' (Discourse) প্রতিষ্ঠার লড়াই। ফুকো তার '*Discipline and Punish*' গ্রন্থে সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলেছেন, যেখানে শাসক বা সার্বভৌম শক্তি প্রজার জীবন বা মৃত্যুর ওপর চূড়ান্ত অধিকার রাখে। মনসার সার্বভৌমত্বমনসামঙ্গল কাব্যে দেবী মনসা নিজেকে একজন সার্বভৌম শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তার ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হলো ভয় এবং দণ্ড। চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে হত্যা করা এবং তার সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দেওয়া—এই ঘটনাগুলো ফুকোর 'Right of Death' বা 'মেরে ফেলার অধিকার'-এর প্রতিফলন। ফুকো বলেছিলেন, সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেকে জাহির করে জনসমক্ষে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে। মনসা যখন একে একে চাঁদের সব সম্পদ ও পরিজনকে ধ্বংস করেন, তখন তিনি মূলত সমাজের সামনে নিজের ক্ষমতার ভয়াবহতা প্রদর্শন করেন যাতে অন্যরা তার বশ্যতা স্বীকার করে (Foucault, *Discipline and Punish* 45)।

মঙ্গলকাব্যগুলির রচনাকাল হিসেবে সাধারণত বলা যেতে পারে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, যদিও ত্রয়োদশ শতকে রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরী মঙ্গল'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যাই হোক, আমাদের আলোচনায় শুধু প্রাক-চৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিই বিবেচ্য, কারণ চৈতন্য পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্য রচনা একটি ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়। অতএব আমাদের দেখতে হবে প্রাক-চৈতন্য যুগে মঙ্গলকাব্য রচনার বা উদ্ভবের কারণ কী? সেই সময় রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন কী পালাবদল ঘটেছিল যার জন্য মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হল? এই কাব্য কি শুধুমাত্র কবিদের স্ব-ইচ্ছার ফল, নাকি তার পেছনে কোনো ক্ষমতার প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল? সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাক-চৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এছাড়া চণ্ডীমঙ্গল অষ্টাদশ শতকে নিজস্ব মহিমা পায়। অতএব মনসামঙ্গলকেই এখানে প্রধানভাবে তুলে ধরা হবে। প্রাক-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল কবি বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য মূলত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য। বলা ভালো অনার্য দেবী, তা সে মনসা হোক বা চণ্ডী হোক, উচ্চবর্ণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত

হতে গেলে কোনো উচ্চবর্ণ সমাজের ব্যক্তির দ্বারা পূজিত হতে হবে। তাই দেখা যায়, মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা নানা ঘটনা ঘটিয়েছে— তার কাহিনি মঙ্গলকাব্যে প্রতিষ্ঠিত। ফুকো 'প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস' চর্চার বিরোধিতা করে বংশানুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক যুগের ক্ষমতা/জ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখলে তাতে উঠে আসবে প্রকৃত সত্য। কারণ প্রত্যেক সমাজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক জড়িত, ফলে সমাজের পরিসরে যে সন্দর্ভ বা ডিসকোর্স গড়ে ওঠে তা যেমন জ্ঞানের জন্ম দেয়, তেমনি এক ধরনের ক্ষমতাকেও নির্মাণ করে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক সন্দর্ভের সঙ্গে যেহেতু একটি সামাজিক ও মতাদর্শগত মাত্রা বিদ্যমান, তাই প্রত্যেক সন্দর্ভই কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার বিষয়ক প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। ফুকোর মতে ক্ষমতাই সত্যের সবচেয়ে বড় নির্ধারক কারণ তিনি মনে করেন শাশ্বত সত্য বলে কিছু হয় না।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা সাধারণত অনার্য সমাজে পূজিত— যা উচ্চবর্ণ বা আর্য সমাজের কাছে অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত। অথচ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন উচ্চবর্ণ ব্যক্তির দ্বারা পূজা। আমরা জানি, মনু হিন্দু সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করেন। তার মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে। সেই বিচারে বলা যেত, ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত হলে অনার্য দেবীরা সমাজে উঠতে পারত। কিন্তু তা না করে কেন বণিক দ্বারা পূজিত হল? ফুকোর মতে প্রত্যেক সমাজের ক্ষমতা ক্রিয়াশীল থাকে। এই ক্ষমতা জন্ম দেয় এক একটি ডিসকোর্সের। এই ডিসকোর্সগুলির মধ্যে লড়াই চলে। ফলে কোনো বিশেষ সময় একটি প্রভাবশালী (Dominant) এবং অন্যগুলি অবদমিত (Subjugated) বা প্রান্তিক (Marginalised) ডিসকোর্স হয়ে ওঠে। ডিসকোর্স কখনোই পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়, তা গড়ে ওঠে যুগের অন্যান্য ক্ষমতার—যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় শক্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। ফুকো দেখান যে আমরা যাকে 'জ্ঞান' বলি তা সম্ভব হয় ডিসকোর্সের গুরুত্ব বৃদ্ধি হলে, এই পদ্ধতিতে সৃজনশীল ব্যক্তির ওপরও প্রভাব পড়ে। অতএব সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোন ডিসকোর্স প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবে। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বণিকদের দ্বারা পূজিত হওয়ার কারণ। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে ব্রাহ্মণরাই সমাজের উচ্চস্থানে এবং তাদের হাতে ছিল শাসন ক্ষমতা। কিন্তু তুর্কি আক্রমণের ফলে প্রাচীন সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিমরা হয় শাসক এবং সমাজে প্রধান ডিসকোর্স হিসেবে দেখা দেয় অর্থনীতি। তখন ব্রাহ্মণরা ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন হারায়। তারা সবদিক থেকে বণিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। একসময় ব্রাহ্মণরা তাদের ব্রাহ্মণ্যত্ব হারায়—সেখানে সমাজে বণিকরাই ধনে-প্রাণে উচ্চস্থানের অধিকারী হয়। ফলে অনার্য দেবীরা ব্রাহ্মণদের থেকে বণিকদের দ্বারা পূজিত হওয়াই শ্রেয় মনে করে।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের কাছে যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, দেবী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী করেছেন, বিরোধিতা করলে সর্বনাশ করেছেন। বিপদের দিনে মানুষ শিবকে ছেড়ে শক্তি বা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরল। বণিকরা ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। অনার্য বা লোকজ সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ধারক বনিক জাতির দিয়ে তাদের সংস্কৃতিকে নবীকরণ দিতে চেয়েছিল, তাই মনসা চাঁদ সওদাগরকে, চণ্ডী ধপতিকে দিয়ে পূজা প্রচার করতে চেয়েছে। চাঁদ পূজা প্রত্যাখ্যান করায় মনসা তাকে সর্বহারায় পরিণত করে। মনসা একের পর এক সাত পুত্র, ধন-সম্পদপূর্ণ সপ্তডিঙ্গা, মধুকর ও যাবতীয় বিষয় ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করে দেয়, নিঃস্ব অসহায় চাঁদ সব হারিয়ে এক বস্ত্র পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার উপলব্ধি হয়—বণিক সমাজে প্রতিপত্তি ও খ্যাতি প্রতিপালন করে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন ক্ষমতার সমাজ টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন বা অস্ত্র। তাই চাঁদকে ক্ষমতার কাছে মাথা নত করতে হয়। এখানে ক্ষমতা বা শক্তির জয় হয়। ফুকোর মতে যেখানে আছে শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার সেখানে থাকবে প্রতিরোধের অনিবার্য স্পৃহা। এই প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর *'মিশেল ফুকো, তাঁর চিন্তা'* গ্রন্থের 'সাহিত্য চিন্তা' অধ্যায়ে বলেন-

> "সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আজো অব্যাহত বিদ্রোহ থাকে চিন্তা প্রতিষ্ঠানের প্রথাগত বিভাজন ও সার্বভৌমত্ব তিনি অস্বীকার করেছিলেন... সাহিত্যসাধক ও চিন্তাবিদরা এমন এক বহুমুখী জগতের মুখোমুখি হন যাতে কোনো প্রতাপ কেন্দ্র নেই এবং স্বভাবত নেই কেন্দ্রীয়তার প্রাসঙ্গিকতা... আধিপত্যবাদীদের একান্ত শাসনে ও পেষণে অন্তর্বাসীদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে গিয়েছিল ইতিহাসের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপে। ফুকো সাহিত্য তাত্ত্বিকদের এইসব নীরব অস্তিত্বদের পুনর্বাসন দেওয়ার উপযোগী পথের দিশা দেখিয়েছেন" (Bhattacharya 58) ।

সে যুগের তুর্কি আক্রমণের পূর্বে ক্ষমতার প্রতাপ কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মণ। তাই সে যুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যুগের সংস্কৃতির যুগসংস্কৃত সাহিত্যিক প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। সেখানে নিম্নজাতি প্রান্তিকতায় ছিল। কারণ সে সময় উচ্চ-নিম্ন জাতির মধ্যে বিস্তর ভেদ ছিল। কিন্তু তুর্কি আক্রমণের ফলে সমাজ জীবনে সে পালাবদল ঘটায়, তাতে সমাজ বুঝতে পারে অনার্য সংস্কৃতিই শক্তির প্রধান কেন্দ্র। কাজেই সে যুগের কবিরা এই সমস্ত নিরুচ্চার বর্গ, প্রান্তিক অনার্য জাতিকে তাদের সাহিত্যে স্থান দিলেন, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের মিলন ঘটালেন। অর্থাৎ আধিপত্যশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি এটি ছিল এক প্রকার তীব্র প্রতিবাদ। ফুকো রাজনীতির কথাও বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি *'Discipline and Punish'* গ্রন্থে বেন্থামের প্যান-অপটিকন মডেলের কথা বলেন—প্রতিষ্ঠান মানুষের রীতি-অনুসারী করে তোলার জন্য নীরব অদৃশ্য প্রশিক্ষণ চালায়। প্যান-অপটিক্যাল মডেল আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই ধারণার জন্ম জেরেমি বেন্থামের হাতে হলেও, মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি নতুন তাত্ত্বিক গভীরতা লাভ করে। বেন্থাম যেখানে প্যানঅপটিকনকে একটি যুক্তিনিষ্ঠ, সংস্কারমূলক ও উপযোগবাদী সামাজিক প্রকল্প হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, ফুকো সেখানে একে আধুনিক ক্ষমতা, নজরদারি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। জেরেমি বেন্থাম আঠারো শতকের শেষভাগের একজন চিন্তাবিদ, যিনি আলোকায়ন যুগের যুক্তিবাদী ধারার প্রতিনিধি। তাঁর চিন্তায় যুক্তি, কার্যকারিতা এবং মানবকল্যাণ ছিল কেন্দ্রীয়। উপযোগবাদী দর্শনের আলোকে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। কারাগার, আদালত, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা— সব ক্ষেত্রেই তিনি অকার্যকারিতা ও নিষ্ঠুরতা দূর করার পক্ষে ছিলেন। প্যানঅপটিকন ছিল এই সংস্কারবাদী প্রকল্পেরই অংশ। অন্যদিকে, মিশেল ফুকো বিশ শতকের একজন চিন্তাবিদ, যিনি আধুনিকতার সমালোচক। তাঁর বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপ, যেখানে রাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মানুষের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। ফুকো আলোকায়ন যুগের প্রগতিশীল বর্ণনাকে প্রশ্ন করেন এবং দেখান যে যুক্তি ও জ্ঞান প্রায়ই ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি বেন্থামের প্যানঅপটিকনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন।

মিশেল ফুকোর দর্শনে 'প্যানোপটিকন' কেবল একটি জেলখানার নকশা নয়, বরং এটি আধুনিক সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর একটি নিখুঁত রূপক। ১৭৯১ সালে ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম প্রথম এই নকশাটি তৈরি করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ফুকো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Discipline and Punish'*-এ এই মডেলটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। ফুকোর মতে, আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে আমরা সারাক্ষণ নজরদারির শিকার, এবং এই নজরদারিই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে। বেন্থামের প্যানোপটিকন ছিল একটি গোলাকার দালান। এর একদম কেন্দ্রে একটি 'পর্যবেক্ষণ টাওয়ার' থাকে এবং চারদিকের পরিধিতে থাকে কয়েদিদের সেল। সেলের জানলাগুলো এমনভাবে তৈরি যে আলো টাওয়ারের দিক থেকে আসে। ফলে টাওয়ারে বসে থাকা রক্ষী কয়েদিদের সবকিছু দেখতে পায়। কয়েদিরা জানে টাওয়ারে কেউ আছে, কিন্তু তারা

অন্ধকার বা জানলার কারুকাজের কারণে রক্ষীকে দেখতে পায় না। বেন্থাম চেয়েছিলেন কম খরচে এবং কম লোকবল দিয়ে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। ফুকো প্যানোপটিকনকে কেবল জেলখানার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি একে ক্ষমতার একটি 'প্রযুক্তি' হিসেবে দেখেছেন। ক্ষমতা তখনই সবচেয়ে সফল হয়, যখন তাকে দেখা যায় না কিন্তু তার প্রভাব সারাক্ষণ অনুভূত হয় (Basu 67)।

ফুকোর মতে, যখন একজন কয়েদি বা ব্যক্তি জানে না যে তাকে ঠিক কোন মুহূর্তে দেখা হচ্ছে, তখন সে ধরে নেয় যে তাকে সারাক্ষণই দেখা হচ্ছে। এই ভয়ের কারণে সে নিজেই নিজের ওপর নজরদারি শুরু করে। অর্থাৎ, বাইরের কোনো পাহারাদারের লাঠির চেয়ে তার নিজের মনের ভেতরের 'ভয়' তাকে বেশি সুশৃঙ্খল করে তোলে।ফুকো দেখিয়েছেন যে, প্যানোপটিকন মডেলটি জেলখানা থেকে বেরিয়ে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চের বিন্যাস এবং শিক্ষকের নজরদারি শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলে। সিসিটিভি বা সুপারভাইজারের উপস্থিতি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বাধ্য করে। রোগীদের প্রতিটি শারীরিক পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়, যা এক ধরণের বৈজ্ঞানিক নজরদারি। মিশেল ফুকোর প্যানোপটিকন তত্ত্ব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক স্বাধীনতা অনেকটা বিভ্রান্তি মাত্র। আমরা আমাদের অজান্তেই একটি অদৃশ্য নজরদারির খাঁচায় বন্দী হয়ে পড়েছি। এই তত্ত্ব কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা দর্শনের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের অস্তিত্বের এক গভীর সংকটকে তুলে ধরে। মিশেল ফুকোর 'প্যানোপটিকন' (Panopticon) তত্ত্বটি আধুনিক সমাজকে বোঝার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী চাবিকাঠি। ফুকো দেখিয়েছেন যে, প্যানোপটিকন কেবল একটি জেলখানার নকশা নয়; এটি এমন একটি সূক্ষ্ম ক্ষমতার কৌশল যা আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে; স্কুল থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্ত অদৃশ্যভাবে কাজ করে চলেছে (Basu 58)।

নজর বন্দি করে রাখতে পারলে তবেই সে মানুষকে অনুশাসনে বাঁধে মানুষের চেতনাকে। অনুশাসনের উদ্দেশ্য স্ব-শাসন— তাকে এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে সে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফুকোর মতে প্রাতিষ্ঠানিক শাসন মানুষের ওপর দু'ধরনের আধিপত্য কায়েম করে—একদিকে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিচয়ে বিভক্ত করে, অন্যদিকে নজরে রেখে দেখে সে শাসনের অনুমোদিত, বাধ্য বা স্বাভাবিক ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠছে কিনা। যারা সেভাবে গড়ে ওঠে না সমস্যা হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক করতে (Normalize) দরকার হয় বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারাগার। যদিও এই তত্ত্ব আধুনিক এনলাইটেনমেন্ট যুগে প্রযোজ্য, তবুও বলা যায় মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পেছনেও একভাবে সমাজে এটি প্রযোজ্য। তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার হিন্দু ধর্ম ছিল বিপন্ন (এছাড়াও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিচের তলার মানুষরা দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, এমনকি ব্রাহ্মণরাও নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিল)। তাই সে যুগের কবিরা হিন্দু ধর্মে মানুষ ফেরানোর জন্য ভক্তি নয়, ভয়কে আশ্রয় নেয়। ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভক্তিতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাই দেখা যায়—মনসা বা চণ্ডীকে পূজা করলেও ধন-ভাগ্য আসে, না করলে সর্বনাশ হয়। এমনকি মুসলমানরাও সে দেবীর হাতে পরাজিত—মনসা মঙ্গলে হাসান-হোসেন যার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ ক্ষমতাই যে ডিসকোর্সের জন্ম দেয়, তেমনি ডিসকোর্সের মধ্য থেকেই পরিচালিত হয় ক্ষমতা তথা অনুশাসন তত্ত্ব, যা সে যুগের মানুষের চেতনার ওপর প্রভাব ফেলেছিল। সাম্প্রতিক কালের পূজাকালেও। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে অনুশাসন তত্ত্ব কতটা সুদূরপ্রসারী— যা রক্তের অনু-পরমাণুতে খেলছে।

মিশেল ফুকো তাঁর '*Discipline and Punish*' বইতে সার্বভৌম ক্ষমতার (Sovereign Power) কথা বলেছেন। মনসা এখানে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে চান, যিনি জীবন ও মৃত্যুর ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রাখেন। অন্যদিকে, চাঁদ সদাগর হলেন তৎকালীন সমাজের প্রতিষ্ঠিত 'এলিট' বা উচ্চবর্গীয় ক্ষমতার প্রতিনিধি।

চাঁদ সদাগরের ক্ষমতা কোনো দৈব ক্ষমতা ছিল না, তা ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। বণিক হিসেবে তাঁর যে প্রতিপত্তি, তা ফুকোর তত্ত্ব অনুযায়ী একটি সুশৃঙ্খল নেটওয়ার্কের ফসল। তিনি শিবের উপাসক— যা সেই সময়ে একটি 'হেজিমোনিক' বা আধিপত্যবাদী ধর্মীয় ডিসকোর্স। ফুকো মনে করতেন, ক্ষমতা এবং জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। চাঁদ সদাগরের কাছে 'জ্ঞান' হলো তাঁর আভিজাত্য এবং শৈব দর্শন। তাঁর কাছে মনসা হলেন একজন 'নিচুতলার' দেবী, যাঁর কোনো শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি নেই। চাঁদ যখন মনসাকে 'কানী' বা 'চেঙমুড়ী' বলে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তখন তিনি আসলে একটি উচ্চবর্গীয় জ্ঞান-কাঠামো থেকে কথা বলছেন। মনসা এখানে একটি নতুন ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। ফুকোর মতে, কোনো নতুন ক্ষমতা যখন আসে, তখন সে পুরনো জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের 'সত্য' (Truth) প্রতিষ্ঠা করে। চাঁদ সদাগর এই নতুন 'সত্য' বা নতুন ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। ফুকো দেখিয়েছেন যে ক্ষমতা যেখানে আছে, সেখানে প্রতিরোধও (Resistance) আছে। চাঁদ সদাগরের চরিত্রে আমরা এই প্রতিরোধের চূড়ান্ত রূপ দেখি। লখিন্দরের লোহার বাসর ঘরটি ছিল নজরদারি এবং নিরাপত্তার এক প্রতীক। চাঁদ সদাগর প্রযুক্তি এবং স্থাপত্যের মাধ্যমে (লোহার ঘর) মনসার ক্ষমতার প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এটি ফুকোর সেই 'প্যানোপটিক' নজরদারির উল্টো পিঠ— যেখানে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষমতার নজর থেকে আড়াল করতে চায়। মনসা তাঁর ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছেন সর্পকুলের মাধ্যমে। ফুকোর তত্ত্বে যেমন 'নজরদারি'র মাধ্যমে ক্ষমতা কাজ করে, মনসার সাপগুলো ছিল তেমনই এক অদৃশ্য গোয়েন্দা বাহিনী। লোহার ঘরের ছিদ্র দিয়ে সাপের প্রবেশ প্রমাণ করে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা বা নজরদারি কতটা সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী হতে পারে।

ফুকোর ক্ষমতার অন্যতম প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হলো শরীর। মনসামঙ্গলে লখিন্দরের মৃত্যু এবং চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের বিনাশ আসলে 'শরীরকে শৃঙ্খলিত' করার চেষ্টা। চাঁদ সদাগর যখন বারবার মনসাকে প্রত্যাখ্যান করেন, মনসা তখন তাঁর প্রিয়জনদের শরীরকে আঘাত করেন। ফুকোর মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা যখন বিপন্ন বোধ করে, তখন সে প্রজার শরীরের ওপর নিজের নিষ্ঠুর অধিকার জাহির করে। ছয় পুত্রের মৃত্যু হলো মনসার সেই ক্ষমতার আস্ফালন। কাব্যের শেষে চাঁদ সদাগর মনসাকে পূজা দিতে রাজি হন, কিন্তু তিনি তা করেন বাম হাতে এবং মনসার দিকে না তাকিয়ে। ফুকোর ভাষায় এটি হলো 'Tactical Reversal'। চাঁদ সদাগর তাঁর সামাজিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারাননি। তিনি মনসাকে পূজা দিলেও তাঁর ভেতরের আদর্শিক প্রতিরোধটি বজায় রেখেছেন। ফুকো যেমন বলেছিলেন, ক্ষমতা কখনোই কোনো ব্যক্তিকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিতে পারে না; ব্যক্তি সবসময়ই ক্ষমতার সঙ্গে দরকষাকষি বা নেগোসিয়েশন করে। চাঁদের 'বাম হাতে ফুল দেওয়া' হলো সেই দরকষাকষির চূড়ান্ত প্রকাশ। মিশেল ফুকোর দৃষ্টিতে চাঁদ সদাগর কেবল একগুঁয়ে এক বৃদ্ধ নন; তিনি হলেন ক্ষমতার এমন এক বিন্দু যেখানে ধর্ম, সমাজ এবং ব্যক্তিগত জেদ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। মনসা যদি হন 'সার্বভৌম ক্ষমতার' প্রতিনিধি, তবে চাঁদ সদাগর হলেন 'প্রতিরোধের' সেই কণ্ঠস্বর যা প্রমাণ করে যে ক্ষমতা কখনোই একপাক্ষিক নয়। শেষ পর্যন্ত চাঁদ সদাগরের হাতে যে ক্ষমতা এসেছিল, তা কেবল দেবতার আশীর্বাদ নয়, বরং তা ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের পর নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে ক্ষমতার জালে টিকে থাকার এক কৌশল। মনসামঙ্গল তাই কেবল দেবতার জয়ের গল্প নয়, এটি হলো ফুকোর বর্ণিত সেই ধ্রুপদী লড়াই যেখানে ক্ষমতা এবং প্রতিরোধ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ফুকোর মতে, ক্ষমতা এবং জ্ঞান (Power/Knowledge) একে অপরের পরিপূরক। কোনো একটি মতবাদ বা 'সত্য' যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে ঘিরে একটি 'ডিসকোর্স' তৈরি হয়। চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। সেই সময়ে শিব উপাসনা ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত ও 'অভিজাত' ডিসকোর্স। মনসা

একজন লৌকিক দেবী। তিনি এই প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের জন্য একটি জায়গা তৈরি করতে চান। চাঁদ সদাগরের কাছে মনসার পূজা মানে কেবল একটি ফুল দেওয়া নয়, বরং একটি নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রকে স্বীকার করে নেওয়া। চাঁদ যখন মনসাকে 'কানী' বা 'চেঙমুড়ী' বলে উপহাস করেন, তখন তিনি আসলে সেই নতুন ডিসকোর্সকে প্রত্যাখ্যান করেন। ফুকোর প্যানোপটিকন বা নজরদারির ধারণাটি মনসামঙ্গলে এক ভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।মনসার প্রধান অস্ত্র হলো সর্প। সাপ এখানে ক্ষমতার 'স্পাই' বা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। লখিন্দরের লোহার বাসর ঘর ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার প্রতীক। কিন্তু ক্ষমতার নজরদারি বা অনুপ্রবেশ রুখতে সেই দেওয়ালের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রই যথেষ্ট ছিল। চাঁদ সদাগর যেখানেই যান, সেখানেই মনসার নজরদারি তাকে তাড়া করে ফেরে। ফুকো যেমন বলেছিলেন, ক্ষমতা কেবল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, তা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। মনসা তার অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে চাঁদের জীবনের প্রতিটি ব্যক্তিগত পরিসরে (যেমন বাসর ঘর) প্রবেশ করেন, যা ক্ষমতার 'অণু-পদার্থবিদ্যা'র একটি চমৎকার উদাহরণ। ফুকোর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো— *"Where there is power, there is resistance."*মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর হলেন সেই প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক। ক্ষমতার চরম আস্ফালন (পুত্রের মৃত্যু, সহায়-সম্বল হারানো) সত্ত্বেও চাঁদ মাথা নত করেননি। এটি প্রমাণ করে যে ক্ষমতা কখনোই নিরঙ্কুশ নয়। প্রতিরোধের মাধ্যমেই ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হয়।চাঁদ সদাগরের প্রতিরোধ কেবল ধর্মীয় নয়, এটি একটি রাজনৈতিক অবস্থানও বটে। তিনি পুরুষতান্ত্রিক ও প্রতিষ্ঠিত শৈব ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হিসেবে একজন 'নতুন' এবং 'নারী' দেবীর আধিপত্য মানতে নারাজ ছিলেন। কাব্যের শেষ অংশে বেহুলা যখন মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় চড়ে দেবপুরীতে যান, সেখানে ক্ষমতার একটি নতুন রূপ ফুটে ওঠে। ফুকোর 'Biopower' বা জৈব-ক্ষমতা অনুযায়ী, আধুনিক ক্ষমতা কেবল মৃত্যু দিয়ে নয়, বরং 'জীবন পরিচালনা'র মাধ্যমে কাজ করে। মনসা যখন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন, তখন তিনি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে কেবল ধ্বংস নয়, জীবন দেওয়ার ক্ষমতাও তার হাতে। বেহুলার আত্মত্যাগ এবং বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার একটি সমঝোতা ঘটে। ফুকোর মতে, ক্ষমতার লড়াই সবসময় বিজয়ী বা বিজিত দিয়ে শেষ হয় না, অনেক সময় তা একটি নতুন কৌশলগত অবস্থানে গিয়ে স্থির হয়। কাব্যের শেষে চাঁদ সদাগর মনসাকে পূজা দিতে রাজি হন, কিন্তু তিনি তার চিরচেনা জেদ বজায় রেখে বাম হাতে ফুল দেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুকোবাদি প্রতীক। ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত চাঁদকে বাধ্য করতে পারলেও তার ভেতরের প্রতিরোধের সত্তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। ক্ষমতার এই যে আংশিক জয় এবং আংশিক পরাজয়— এটাই ফুকোর ক্ষমতার তত্ত্বের নির্যাস।

মনসামঙ্গল কাব্য কেবল মনসার বিজয়ের কাহিনী নয়, বরং এটি ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চায় এবং ব্যক্তি কীভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে—তার একটি কালজয়ী আখ্যান। মিশেল ফুকো ক্ষমতাকে যেভাবে বহুমুখী, কৌশলগত এবং অবিচ্ছেদ্য হিসেবে দেখেছেন, মধ্যযুগের কবিরা মনসা ও চাঁদের দ্বন্দ্বে ঠিক সেই সত্যকেই রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মনসা এখানে কেবল এক দেবী নন, তিনি একটি উদীয়মান ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতীক, আর চাঁদ সদাগর হলেন সেই প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর যা আজও শোষিত বা প্রান্তিক মানুষের লড়াইয়ে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

References:

1. Bhattacherya, Asutosh. Bangla Mangalkavyar Itihas. Calcutta, 1998.
2. Bhattacherya, Tapodhir. Michel Foucault & His Theory. Dey's Publishing, 1997.
3. Bandopadhaya, Asit Kumar. Bangala Sahityer Sampurna Itivritta. Calcutta, 1966.
4. Basu, Pradip. Uttar Adhunik Rajniti. Sahitya, 2010.
5. Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the prison. Allen, 1977.
6. Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interview and other writing 1972-1977. Harvester Press, 1980.
7. Foucault, Michel. Politics, Philosophy, Culture: Interviews and other Writings 1977-1984. Routledge, 1990.